৩

তারিখ ... 15 MAR 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

গণতন্ত্রে উপেক্ষিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

অনিরুদ্ধ

একদিনের ব্যবধানে পত্রিকায় দু'টি খবর প্রকাশিত হয়েছে। খবর দু'টি হল, চট্টগ্রামে ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ এবং একজন ছাত্র খুন। গত ১১ই মার্চের খবরে বলা হয়েছে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রদের ফরম দেয়ার সময় সশস্ত্র ছাত্র শিবির কর্মীরা তাদের ওপর হামলা চালায়। এতে ৬ জন ছাত্র আহত হয়েছে। ১৩ই মার্চের খবরে বলা হয়েছে তিনজন ছাত্রকে সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা অপহরণ করে নিয়ে যায়। তাদের একজন ছুরিকাঘাতে নিহত হয়। অপর দু'জনকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পরদিন উদ্ধার করা হয়। এই তিনজন ছাত্র শিবির কর্মী বলে তাদের সংগঠন থেকে বলা হয়েছে। তারা অভিযোগ এনেছে অপহরণকারীরা ছাত্রলীগের সদস্য।

চট্টগ্রামে এই ছাত্র সংঘর্ষের ইতিহাস নতুন নয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ছাত্র সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে সশস্ত্র আস্তানা গেড়ে বসেছে। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যথাসময়ে আইনগত ব্যবস্থা না নেয়ায় কেউ সংগোপনে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়। হিংসার বিরুদ্ধে হিংসা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সন্ত্রাসীদের নিন্দা করার ব্যাপারে বিবৃতিদাতারা স্ব স্ব দলের কর্মীদের অপকর্ম দেখে না, দেখে প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠনের অন্যায়কে।

এ নিয়ে পত্রিকায় বারংবার লেখা হয়েছে যে, ছাত্র রাজনীতিকে অস্ত্রমুক্ত করার জন্য প্রয়োজন স্ব স্ব সংগঠনের অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে দলীয়ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ। দেশের অন্যত্র ছাত্র সংঘর্ষ বিরাট গণআন্দোলনের মুখে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য সন্ত্রাস বন্ধের জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে তাতে অস্থায়ী সরকার সাড়া দিলেও সরকারের পক্ষ থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়।

গণআন্দোলনের সময় দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার পড়েছিল যে, স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িক শক্তি একই উৎসজাত। গণঅভ্যুত্থানে স্বৈরাচারের পতন হয়। সর্বত্র বিজয় উৎসব পালিত হয়। গণঅভ্যুত্থানের সময়ও বিজয় মিছিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পালন করতে গিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ বাধার সম্মুখীন হয়। এটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। এর একটা ইতিহাস আছে।

১৯৮৬ সালে সরকারী ছাত্র সংগঠন জাতীয় ছাত্র সংগঠনের নেতা হামিদের হাত কেটে ইসলামী ছাত্র শিবির চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রাসের রাজত্ব সূচনা করে। তখন অভিযোগ উঠেছিল যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ আলীর ছত্রছায়ায় তারা সাহসী হয়ে ওঠে। এভাবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত হলের প্রভোস্ট, হাউজ টিউটর ও প্রক্টর ইত্যাদি পদে ছাত্র শিবির সমর্থক শিক্ষকদের নিয়োগ করা হয়।

তাদের সমর্থনে ইসলামী ছাত্র শিবির বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সাংগঠনিক কাজেই শুধু বাধা দেয়নি; তাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বাধার সৃষ্টি করত তারা। কিন্তু তাদের আবদারের মাত্রা বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত উপাচার্যকে পদত্যাগ করতে হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন কি পড়ানো যাবে কি যাবে না তার ওপর মাতব্বরী করত ইসলামী ছাত্র শিবির। এরশাদ সরকার কোন ব্যবস্থা নেয়নি। নতুন উপাচার্য অধ্যাপক আলমগীর মোঃ সিরাজউদ্দিন উপাচার্য হওয়ার পর গত বছর ৮ই ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের (চাকসু) নির্বাচন হয়। সকল ছাত্র প্রতিষ্ঠান এক হয়ে শিবিরকে পরাস্ত করে। মাত্র একটি হলে ছাত্রশিবির জয়ী হয়। কিন্তু তারা নানাভাবে সকল কর্মকাণ্ডে বাধা সৃষ্টি করে চলে। তাদের সমর্থক শিক্ষকরা এ ব্যাপারে তাদের প্রশ্রয় ও উস্কানি দিতে থাকে।

অক্টোবর '৯০-এ স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলন শুরু হওয়ার পর ওখানকার শিক্ষক সমিতি চুপচাপ থাকে। আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন ২৯শে নভেম্বর শিক্ষক সমিতি আকস্মিকভাবে উপাচার্যের পদত্যাগ দাবী করে, কিন্তু নিজেদের পদত্যাগ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি।

১২ই ডিসেম্বর '৯০ চাকসু ও সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের উদ্যোগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজয় দিবস পালিত হয়। সেখানে প্রধান অতিথির ভাষণে উপাচার্য বলেন যে, "৭১-এর স্বাধীনতাবিরোধীরা ৯০তে বিপ্লবী সেজেছে, তাই গণতন্ত্র নিরাপদ হতে পারে না।" তার এ বক্তব্য প্রত্যাহারের জন্য শিবির কর্মীরা চাপ দিতে থাকে। সাধারণ শিক্ষকদের কয়েকজন শিবির কর্মীদের হাতে নাজেহাল হন।

২২শে ডিসেম্বর ছাত্র শিবির লাগাতার হরতাল ঘোষণা করে। তাদের দাবী উপাচার্যের পদত্যাগ। শিক্ষক সমিতি এ দাবীর পেছনে ছিল।

সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে জড়ো হয়। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ মোতায়েন ছিল। চাকসু'র সাধারণ সম্পাদক গেট খুলে দিতে আহ্বান জানালে ছাত্র শিবির কর্মীরা গেট খুলে দেয়। কিছু ছাত্রছাত্রী ক্যাম্পাসে প্রবেশের পর তাদের ওপর হামলা চালানো হয় পুলিশের উপস্থিতিতে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা লাঞ্ছিত হন। ছাত্রীদের শাড়ী টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা অনেকে আহত হন। পুলিশ থাকে নীরব।

স্বৈরাচারমুক্ত পরিবেশে এমন বর্বরতার নজির সম্পর্কে এ পত্রিকায় ওই সময় মন্তব্য করা হয়েছিল। ঘটনার তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। লক্ষ্য করার বিষয় এতবড় একটা বর্বরতা সম্পর্কে একটি বৃহৎ দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা একেবারেই নীরব ছিলেন। ফলে এ রকম একটা ধারণার সৃষ্টি হয়, আসন্ন নির্বাচনের মুখে সম্ভাব্য সহযোগীদের মন বিগড়ে দেয়া উচিত নয় বলেই এই সংযম অবলম্বন করা হয়। তিন জোটের সভায়ও একটি দল ছাত্র শিবিরের নাম করে নিন্দা করতে আপত্তি জানায়। এ ধরনের দুর্বলতার মুখে অস্থায়ী সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় খুব একটা তৎপর ছিল এমন বলা যাবে না। এমনকি গণতন্ত্রের অভিযাত্রা চট্টগ্রাম গেলেও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা সম্পর্কে নীরব থেকে গণতন্ত্রের নৈর্ব্যক্তিক গুণাবলীর ব্যাখ্যা এবং 'আমার ভোট আমি দেব যাকে ইচ্ছা তাকে দেব' এতে সীমিত রাখা হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসমুক্ত করার কথা স্পষ্টভাবে আসেনি। উদ্বেগ ও বিবৃতির মধ্যেই সকল দায়-দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়।

অনেকে এজন্য বলেন, সংবাদপত্র কেন এগিয়ে এল না। তারা একটা কথা ভুলে যান যে, সংবাদপত্র এক ধরনের বিরোধী ভূমিকা পালন করলেও তা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতামতের প্রতিফলনকে প্রধানত তুলে ধরে। জনমত গঠনের ক্ষেত্রে তারা রাজনৈতিক বিচ্ছিন্ন কোন পৃথক ধ্যান-ধারণার প্রবক্তা হতে পারে না। তাই দেখা যায় একই ঘটনাকে বিভিন্ন পত্রিকা ভিন্ন ভিন্ন বিশ্লেষণে ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পরিবেশন করে। যেখানে জাতীয় ঐকমত্য অনুপস্থিত থাকে সেখানে দুর্যোগের রাত হয় দীর্ঘ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সে কথাই বলা চলে।

তাই দেখা গেল, সমস্ত দেশ রাহুমুক্ত হল বলে যে উচ্ছ্বাস ও আনন্দের উদ্বেল প্রবাহ তার তরঙ্গাভিঘাত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তটে কোন আঘাত হানতে পারেনি। একপক্ষকালের মধ্যেই লাঞ্ছিতা এক শিক্ষিকার ভাষায়, সেদিন সেখানে দখলকারী বাহিনীর আমলের মত বাংলাদেশের এক মিনি '৭১-এর অভিনয় হয়ে গেল। সেদিন ছাত্র শিবিরের সমর্থক এক শিক্ষকের সামনে ছাত্রীদের শাড়ী টেনে ছিঁড়ে ফেলা হল, শিক্ষিকার মাথায় ইট দিয়ে আঘাত করা হল। তিনি ছিলেন নিশ্চুপ। রাজনৈতিক মহল থেকে এ নিয়ে প্রতিবাদের ভাষা ছিল ক্ষীণ।

এ নিয়ে প্রচুর চিঠিপত্র এসেছে পত্রিকা অফিসে। কিন্তু ছাপানোর কী সার্থকতা আছে যেখানে ওই চিঠির লেখিকা শাহনাজ শারমিন বলেন, "আহতদের নিয়ে যখন আমরা ক্যাম্পাস ত্যাগ করতে ছিলাম তখন দেখি ২নং গেটের কাছে একজন পুলিশ অফিসার একজন চিহ্নিত শিবির নেতার কাঁধে হাত রেখে হেসে হেসে ওয়ারলেসে খবর পাঠাচ্ছেন।" এমন দৃশ্য ঢাকায় ৩১শে অক্টোবর '৯০তে দেখা গেছে দোকানপাট লুট হওয়ার সময়। তবে সেদিন ছিল স্বৈরাচারের নির্দেশে। আর এদিন ক্ষমতায় ছিল "স্বৈরশাসনমুক্ত" তত্ত্বাবধায়ক সরকার। কিন্তু এ ঘটনা সম্পর্কে রাজনীতিকদের ভূমিকা এক ছিল না।

আমাদের দুর্ভাগ্য স্বৈরাচারমুক্ত এবং একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশে আনন্দ উৎসবের বিহ্বলতায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ঘটনাকে কেউ তেমন গুরুত্ব দেয়নি। তা না হলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এখনও বন্ধ থাকে কেন। কিন্তু সন্ত্রাস ও হামলা বন্ধ থাকে না। ফলে গোপন হিংসা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। একজন শিবির কর্মী ছাত্র নিহত হওয়ার দুঃখে ও ক্রোধে তাদের সংগঠন কর্মসূচী নেয়, কিন্তু তারা যখন একইভাবে ফারুকুজ্জামানকে ২৪শে ডিসেম্বর হত্যা করে, তখন তাদের